যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

গ্রীষ্মের শুরুতেই শহরটা গরমে হাঁসফাঁস করছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা তো জানিয়েই দিয়েছেন, এবছরের তাপমাত্রা গত কয়েক দশকের তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙবে। পথচলতি মানুষ হাফ ছেড়ে বাঁচতে গলা ভেজাতে চাইছে কোল্ডড্রিংকস বা প্যারামাউন্টের সরবতে। কিছু মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে রৌদ্রের ঝাঁঝালো তাপ উপেক্ষা করে বিক্রির পসার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে চলেছে। কেউ-বা লাঠি হাতে ময়দানে এদিক-ওদিক ছাগল চড়াচ্ছে। সেই ফাঁকে হয়তো করেও নিচ্ছে তাপমাত্রা বাড়ার কারণ নিয়ে আলোচনা...

ফোটো: **সৌরভ সরকার** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

হৈমন্তী শুক্লা (সংগীত শিল্পী)

কলকাতা আমার জন্মস্থান। জন্মস্থানের প্রতি আলাদা একটা টান তো থাকবেই। কলকাতাকে আমি বড্ড ভালোবাসি। কাজের সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গেলেও মনে মনে ভেবেছি কখন প্লেনের চাকা কলকাতা ছোঁবে। হয়তো বাইরের অনেক কিছু ভালো, কিন্তু কলকাতায় গান গেয়ে যে মজা, কলকাতার মানুষকে গান শুনিয়ে যে আনন্দ পাই, সেটা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাই না।

কলকাতায় খারাপ যা কিছু থাক না কেন, মন মানতে চায় না। মনে হয় কলকাতা কলকাতাই। আগের চেয়ে কলকাতায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে, রাস্তার উন্নতি হয়েছে। সন্ধেবেলা রাস্তায় বেরোলে কলকাতায় আছি না সিঙ্গাপুরে আছি বুঝতে পারি না।, যদিও সিঙ্গাপুর আমার খুব পছন্দ সেটা বলছি না, কিন্তু সেইরকম একটা অ্যাটমোস্ফিয়ার ফিল করি। তাছাড়া কলকাতার জলহাওয়া খুব ভালো। আমার মনে কলকাতায় থাকলে ঋতুগুলো ভালো করে অনুভব করা যায়। বোঝা যায় কোনটা ফাল্গুন মাস, কোনটা চৈত্র মাস। এটা ভারতের অন্য কোথাও এইভাবে বোঝা যায় বলে আমার মনে হয় না।

ভালো লাগে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে সকলে মিলে কী সুন্দর আনন্দে মেতে ওঠে। পুজোর সময় ভিড়ের মধ্যে না বেরোলেও টেলিভিশনে দেখি সবাই কত আনন্দ করছে, মজা করছে। একটা কথা বলতেই হবে— এখানকার মানুষের মধ্যে যতই সমস্যা থাক না কেন তারা সবকিছুকে দূরে সরিয়ে রেখে ভালো থাকতে জানে। কলকাতার যে প্রাণ সেটা অন্য কোথাও পাই না। কলকাতা ছেড়ে অন্যকোথাও একদিন, দু'দিনই ভালো লাগে, তারপরেই মনে হয় কলকাতাই ভালো। এখানে অনেক গরীব, অনেক বড়লোক রয়েছে, আমরা সব গরীব মানুষকে তো সাহায্য করতে পারি না, কিন্তু সবাই যে যার মতো করে রয়েছে। একজন রিকশাওয়ালা সারাদিন রিকশা চালিয়ে দিনের শেষে হয়তো দেখা গেল গান শুনছে, আনন্দ করছে নিজের মতো করে ভালো থাকার চেষ্টা করছে।

একটা কথা বলতেই হবে এখানে আমি গান গেয়ে ভালো আছি, এখনও পর্যন্ত আমি তিন-চারটে প্রজন্মের সঙ্গে গান করলাম, এই পাওয়ার আনন্দটাই তো আলাদা, এই আনন্দটা আর কোথায় পাব? আই লাভ কলকাতা...

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

'অন্ধ হতে পারি, ভিখারি নই'

নীল সরকার

শিয়ালদহগামী বজবজ লোকাল। সকাল ৮টা ৩৫। অফিসটাইম বলে প্রচণ্ড ভিড়। তার ওপরে আজ আবার সাড়ে সাত মিনিট লেট। এরই মধ্যে কোনও রকমে কানহাইয়া হয়ে ফুটবোর্ডে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছি। দামোদর শেঠের মতো ভুঁড়িটা মাঝে-মাঝেই এসে গুঁতো মারছে আমার পেটে। বাঁদিক থেকে কনুইয়ের গুঁতো আর ডানদিক থেকে ঠেলা খেয়ে দাদা যখন প্রায় সেট হয়ে গেছি, ঠিক তখনই কোন ট্রেন দাদা? কোন ট্রেন দাদা? প্রশ্নটা কানে এল। দেখলাম লোকটা তখনও ছুটছে। উত্তরটাও যেন তৈরিই ছিল।

—লোকাল ট্রেন দাদা। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন কমপার্টমেন্টের ভেতরে এক রাউন্ড হাসি পাক খেয়ে গেল। ট্রেন ছুটছে। কিছু লোক বাইরে ঝুলছে। কিছু লোক তখনও ছুটছে। নিত্যযাত্রীরা কেউ কথায় মশগুল, কেউ তাসে। কেউ মুখটা হাঁ করে হাওয়া খেতে খেতে নির্দ্বিধায় ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কেউ আবার শূন্য দৃষ্টিতে শুধুই চেয়ে আছে। লোকাল ট্রেনের এ-ছবি নিত্য ট্রেনযাত্রীদের খুব চেনা। পিএনপিসি, লেগপুলিং, তর্ক-ঝগড়া এসবের মধ্যেও অচেনারা কেমন করে, কিসের টানে যেন পরিচিত হয়ে যায় একে অপরের সাথে। তারপর মনের অন্দরমহলে ঢুকে তার সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে যায়। অনেকটা ওই 'লাইফ ইজ আ জার্নি'র মতোই।

ট্রেন চলছে। বজবজ লোকাল। বজবজ থেকে শিয়ালদহ ৫৫ মিনিটের এই যাত্রায় প্রতিদিন কত ঘটনাই যে ঘটে! তার মধ্যেই দু-একটা ঘটনা রেখাপাত করে যায় মনের অন্দরে। চারপাশে যখন শয়ে শয়ে চোখ সুযোগ খুঁজছে একে অপরকে ঠকানোর, ঠিক তখনই একটা দৃষ্টিহীন মানুষের লড়াইটা চোখে পড়ল। প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম আর পাঁচটা সাধারণ হকারের মতোই। কিন্তু আমার ধারণা যে ভুল

সেটা ভাঙতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল। ততক্ষণে তিনজনের সিটে কোনওভাবে চারজন সেট হয়ে ভীষণরকম হাঁসফাঁস করছি। ছেলেটি লজেন্স বিক্রি করে। আর পাঁচজন সাধারণ হকারের মতোই। প্রথম দেখায় বোঝার উপায় নেই ছেলেটি দৃষ্টিশক্তিহীন। আমার পাশের যাত্রীটি লজেন্স নিয়ে দশ টাকার নোটটা হাতে দিতেই, ছেলেটা মুঠো ভর্তি খুচরো ধরা হাতটা এগিয়ে দিয়ে যাত্রীটিকে বলল, দাদা টাকাটা একটু দেখে নেবেন।

লোকটি বলল, ওটা তুমি রেখে দাও।

ছেলেটি অদ্ভুত একটা হাসি হেসে যাত্রীটিকে বলল, আমি অন্ধ হতে পারি। ভিখারি নই। আমার থেকে লজেন্স কেনার জন্য ধন্যবাদ।

ফোটো: লেখক

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

সেদিনের গ্রে স্ট্রিট, আজকের অরবিন্দ সরণি

সোমনাথ আদক

‘পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে এ পথ চেনা...’ পথ চলতে চলতেই দেখা হয়ে যায় কত পথ। কোথাও তা সরণি, কোথাও স্ট্রিট, কোথাও লেন। তা সে যাই হোক আসলে সব রাস্তারই কিছু কথা থাকে। থাকে ইতিহাস। সে ইতিহাস খুঁজতেই হাঁটতে-হাঁটতে আজ চলে এসেছি কলকাতার এমন এক রাস্তায়, যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থেকে ভারতের এক বিপ্লবীর নাম। তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় কলকাতা আজ ওয়াই-ফাই জোন। রাস্তার গায়েও লেগেছে তার আধুনিকতার ছাপ। বদলেছে রাস্তার গঠন, চরিত্র, কাঠামো। প্রায় তিনশো বছরের ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন শহরে তখনকার কাঁচা মাটির সরু রাস্তা আজ ঝাঁ-চকচকে চওড়া পিচের। আর এই চওড়া পিচের কালো রাস্তায় মাঝেমাঝেই গায়ের পাশ দিয়ে হুঁশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক অটোরিকশা। ওভারটেকের দৌড়ে হাতিবাগান অঞ্চলের অটোরিকশা যে বেশ পারদর্শী, তা বোঝা গেল। এখানকার অটোরিকশা শুধু নিজেদেরই নয়, রীতিমতো ওভারটেকে টেক্কা দেয় বাস, ট্যাক্সিকেও। আর এই রেষারেষির দৌরাত্ম্যে দুর্ঘটনাও যে ঘটে না এমন নয়। তাই মাঝে-মাঝেই খবরের শিরোনামে উঠে আসে আজকের এই অরবিন্দ সরণির নাম। কিন্তু আজ থেকে ২০০ বা ৩০০ বছর আগে কেমন ছিল এই রাস্তাটি সে কথা জানতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে সূচনালগ্নের সেই সাদাকালো কলিকাতাতে।

কলকাতার গোড়াপত্তনের একদম শুরুর দিকে সুতানুটি ছিল ব্যবসায়ীদের সুতোর হাট। সুতো ব্যবসায়ীদের বাসস্থানগুলো পরবর্তীকালেও তাদের ব্যবসার স্থান হয়ে দাঁড়ায়। তাই ওই এলাকার রাস্তা তৈরি ও মেরামতির দায়িত্ব তারা নিয়েছিল। পাশাপাশি খরচ চালানোর জন্য তারা সেই সময় কর ছাড়ের সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। উত্তর কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের সঙ্গে মিশে যাওয়া একটি রাস্তা গ্রে স্ট্রিট।

গ্রে স্ট্রিট আদতে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চার্লস আর্লগ্রে-র নামানুসারে তৈরি রাস্তা। কলকাতার আদি ইতিহাসের পাশাপাশি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এই রাস্তার নাম। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত ঋষি অরবিন্দকে ১৯০৮ সালের ৮ মে গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয়। সেই বাড়িটি আজও রয়েছে। পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দের নামানুসারে গ্রে স্ট্রিট হয়ে যায় অরবিন্দ সরণি। আজকের এই অরবিন্দ সরণিতে রয়েছে সুপ্রাচীন হাতিবাগান টোল, রয়েছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হাতিবাগান বাজার।

মেট্রোপলিটন হয়ে ওঠা এই শহর তবু আজও শিকড়ে বেঁধে রেখেছে তার পুরনো ঐতিহ্য। যেখানে অতীত ও আধুনিকতা হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলেছে পাশাপাশি...

অতীতের দুর্গ ভেঙে সাড়ে ছ’লক্ষ টাকায় নতুন বিল্ডিং

ঝুমা দাস মল্লিক

আট থেক আশি প্রায় সবাই যখন ঝুঁকছে অ্যান্ড্রয়েড-জ্বরে ঠিক তখনি বিভিন্ন ফোনের কোম্পানিগুলো তাদের নিত্যনতুন স্কিম নিয়ে হাজির। ফোর-জি থেকে জিও স্পিড এবং ডেটার দৌলতে শেষ অবধি অফিশিয়াল চিঠিগুলোও যখন অ্যান্টিক হতে বসেছে ঠিক তখনি ডালহৌসি-সংলগ্ন সাদা বাড়িটা যেন তারি সাক্ষী হয়ে মনে করাচ্ছে সে ছিল। সে আছে সে থাকবে। হ্যাঁ সেই বাড়িটাই আজকের জিপিও। যার পাঁজরে কান পাতলে শোনা যাবে তার অতীতের হৃদস্পন্দন। হ্যাঁ, এই জিপিও-ই ছিল এক সময় বিশাল এক দুর্গ, তার ভিতরে ‘ব্ল্যাক হোল’ নামক একটি ঘরের দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা— সবই আঠারো ফুট। দেশীয়দের জন্য এ হেন একটি ‘নিপীড়ন কক্ষ’ বানানো, আর তারপর সেই ঘরে নিজেদের দুর্গতির অলীককাহিনি প্রচার এবং তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস! এতসব নাটক করতে পারত ইংরেজরা!

২০ জুন ১৭৫৬। আক্রান্ত হল সেই দুর্গ। অবিরত গোলাবর্ষণে তাসের ঘরের মতো লুটিয়ে পড়ল ভিতরের সুদৃশ্য রাজভবনটি, অক্ষত রইল না সেনা ব্যারাকও। গভর্নর ড্রেক সমেত ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজদের একাংশ দুর্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল হুগলি নদীতীরের জাহাজে। বাকিদের নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে অচিরেই রণে ভঙ্গ দিলেন সেনাধ্যক্ষ হলওয়েল। দুর্গ দখল করলেন একুশ বছর বয়সি বাংলার শেষ নবাব। তিনি কলকাতার নাম পালটে ‘আলিনগর’ রাখলেন!

এদিকে, বেশ কয়েক মাস পরে ইংল্যান্ডে ফিরে পরাজিত সেই সেনাধ্যক্ষ বিবৃতি দিলেন। সেই দিন নাকি যুদ্ধবন্দিদের অধিকাংশকেই সেই ‘ব্ল্যাক হোল’ কারাগারে পুরে হত্যা করেছে রক্তপিপাসু নবাবসেনারা!

সেই যুদ্ধের নায়ক ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, সহযোদ্ধা ছিলেন সেনাপতি মানিকচাঁদ। স্থান আজকের জিপিও ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল। এখানেই ঘুমিয়ে আছে সিরাজের দাপট কাহিনি, শুধু সময়ের হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে কলকাতার প্রথম ইংরেজ কেল্লা ‘ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম’।

১৭৫৭ সালে ইংরেজরা কলকাতা পুনরাধিকার করার বেশ কিছু পরে কেল্লাটি পরিত্যক্ত হয়। তারও বহু বছর পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এখানে একে একে গড়ে উঠতে থাকে সরকারি বাড়ি-ঘর। কাস্টমস হাউস এবং দক্ষিণ-পূর্বমুখী এই জেনারেল পোস্ট অফিস বা জিপিও। ১৮৬৪ সালে শাসনকর্তা জেনারেল লরেন্স-এর আমলে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। শেষ করতে লেগেছিল প্রায় চার বছর। খরচ হয়েছিল প্রায় সাড়ে ছ’লক্ষ টাকা। স্থপতি ছিলেন ওয়াল্টার গ্র্যানভিল।

আসলে, সিরাজের কাছে পরাজয়ের স্মৃতিবিলোপ কিংবা দেশীয়দের কাছে আস্থাভাজন হয়ে ওঠা— এইসব কারণে

জিপিও-কে একইসঙ্গে নয়নাভিরাম অথচ ‘সুরক্ষার প্রতীক’ করে তুলতে চেয়েছিল ইংরেজরা। নইলে ধনী দেশীয় বা ইংরেজরাও পোস্ট অফিসে টাকা রাখতে বা তার মাধ্যমে জিনিস পাঠাতে ভরসা পাবে কেন? সেকালে ডাক খরচও ছিল বেশি। পালকি, ঘোড়া বা নৌকায় করে চিঠিপত্র ডাকে পাঠানো হতো! জিপিও-কে সাজাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি গ্র্যানভিল। করিন্থিবারান্দা, আশেপাশের লাল রঙা বাড়ির মাঝে ব্যতিক্রমী দুধ সাদা রং, ‘ডোম’-এর তিনদিকে তিনটি ঘড়ি লাল দিঘির পশ্চিম পাড়ে অনন্য স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন হয়ে রয়েছে এই জিপিও। উত্তরের বাড়িটির শেষ প্রান্তে একটি বিশাল দেউড়িও ছিল, কিন্তু ১৯০০ সালে কার্জনের আমলে সেটি ভেঙে ফেলে ইংল্যান্ডের রানির মুকুটের ছাপ যুক্ত একটি লোহার গেট বসানো হয়। তার ঠিক ভিতরেই সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত ইংরেজদের স্মরণে কালো পাথরের একটি শহিদ বেদিও বসানো হয়। ওইখানেই নাকি একসময় ‘ব্ল্যাক হোল’ কারাগার ছিল। এ ছাড়া একটি প্রস্তর ফলক বসিয়ে তাতে উল্লেখ করা হয় ‘ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম’-এর কথা, সিঁড়ি এর ফুটপাথে পিতলের পাট বসিয়ে অতীত কেল্লার সীমানাকেও চিহ্নিত করা হয়। পরাজয়কে মহিমান্বিত করার চেষ্টা!

সেই থেকে জিপিও-র ঘড়িগুলি পার করছে অনেক রাত আর দিন। হুগলি নদী সরে গেছে আরও পশ্চিমে। নিরন্তর স্ফীত হতে থাকা এই জনপদের প্রধান ‘ডাক ও তার’ কেন্দ্র এই বাড়িতে স্মৃতির গোপন সুড়ঙ্গ বলতে রয়ে গেছে কেবল ওই প্রস্তর ফলক আর লোহার গেটটি। জিপিও তো ‘জীবন্তিকা’, অর্থাৎ পরগাছা!

ফোটো: সংগৃহীত

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা

অন্য একটা নতুন শহর

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

সেইসময় কলকাতায় যখন-তখন শোনা যেত গুলির শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ বাস ট্রাম জ্বলে উঠত হু হু করে। ধীরে ধীরে এমন একটা সময় এলো যখন শহরে মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা থাকল না। কেউ বাড়ি থেকে বেরোলে সে আবার প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে কিনা বলা মুশকিল হয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকারে এই শহরে তখন চমকে উঠত বারুদের গন্ধে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে পুলিশ কনস্টেবলের ছিন্নভিন্ন দেহ, তো কোথাও পড়ে থাকছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের লাশ।

তখন শহরে মেয়েরা শুধু শাড়ি পরত। তখন সন্ধেবেলা গা ধুয়ে ছাদে মাদুর পেতে বসে নানা রকম গল্পগুজব হতো। কলকাতার রাস্তায় কত বেশি গাছ ছিল এদিক-ওদিক।

বহুতলের চল শুরু হয়নি। বাড়ির পাঁচিলে দোল খেত মাধবীলতা।

কলকাতা তখন এক যুক্তিবোধহীন কিশোরীর মতো পাগলামি করত। কলকাতার হাতে তখন পয়সা নেই। ঘরে টেলিভিশন আসেনি। সারা পাড়ায় একটা বাড়িতে থাকত টেলিফোন। যাঁদের বাড়িতে ফ্রিজ থাকত তারা ছিলেন রাজা-মহারাজা ধরনের বড়লোক। তখন শহরের গতি ছিল ধীর। বেশিরভাগ ছেলের কাছে চাকরি মানে ছিল লটারি। এদিকে মেয়েরা তখন বাড়িতে হাঁড়ি না-চড়লে তবেই চাকরি করতে বেরোবার কথা ভাবত। অথবা কিছু হাতেগোনা অতি উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন যাঁরা কলেজে পড়াতেন শখে। তখন চাকুরিরতা মেয়েরা লিপস্টিক লাগিয়ে অফিসে না এলে সমস্যা ছিল। মেয়েদের ব্যাগে খুব সন্তর্পণে লুকিয়ে থাকত লিপস্টিক। শহরের মধ্যবিত্ত তল্লাটে যদি কোনও মেয়ে লিপস্টিক পরে ঘুরত তাহলে শুরু হয়ে যেত পাড়ার মোড়ে চোখ টেপাটিপি, বাঁকা কথা, এ ওর গা ঠেলে লিপস্টিক পরিহিতাকে দেখিয়ে বলত 'ওই যে বেরিয়েছে আবার।'

শহরটা তখন এতখানি শহর ছিলনা। একটা বড়সড় গ্রাম ছিল যেন।

তখন ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম ছিল না। এয়ার কন্ডিশন চলত শুধু সদাগরি অফিসের দু-একটা ঘরে, পার্ক স্ট্রিটের বেজায় দামি পানশালাগুলোতে, গ্র্যান্ড হোটেলে আর অপরিমিত ধনী কয়েকটি অবাঙালি বাড়িতে। কোনও বাঙালি বাড়িতে এসি থাকলে ধরে নিতে হতো তিনি অন্য গ্রহের মানুষ; কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন।

কলকাতা তখন পুরী, দার্জিলিং বেড়াতে যেত গরমকালে। শীতকালে রাঁচি, মধুপুর।

গাড়ি ছিল শুধু লাখপতি বড়লোকেদের। হ্যাঁ, তখন লক্ষ টাকা মানে ছিল অনেক অনেক টাকা।

বাঙালি মধ্যবিত্তর সঞ্চয় বলতে ছিল কয়েক হাজার টাকা মাত্র। মেয়েরা অনেকেই কিন্তু তখন বেশ সোনার গয়নাগাটি পরে রাস্তায় বেরতো। ছেলেমেয়েরা স্কুল ফাইনাল পাস করে বাড়ি থেকে উপহার পেত হাতঘড়ি।

অল্প বয়েসি ছেলেরা রাত করে বাড়ি ফিরলে তখন লোকে ভাবত ছেলেটা নকশাল হয়ে গেল বুঝি। অল্প বয়েসি মেয়েরা রাত করে বাড়িতে ঢুকলে পাড়ার লোকে টেরা বাঁকা হাসত। মানে দাঁড়াতো মেয়েটা দেহ ব্যবসা ধরেছে নিশ্চিত।

পুলিশকে তখন সাধারণ মানুষ ভারি ভয় পেত।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর কবিতা মধ্যবিত্ত পড়ত না। চিনতই না কবিদের। যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখতেন তাঁদের কিন্তু সাধারণ বাঙালি জানত।

বালিগঞ্জ তখন ফাঁকা আর অজস্র গাছপালায় ঘেরা ছিল। ওখানে কিছুটা দূরে দূরে ছিল বাংলো প্যাটার্নের সুন্দর সুন্দর বাড়ি। সেইসব বাড়ির পুরুষরা মুখে পাইপ রেখে বিলিতি উচ্চারণে কথা বলতেন। সেইসব বাড়ির মেয়েরা ব্যবহার করতেন বিদেশি সুগন্ধি। সেইসব বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকত একটা দুধসাদা অ্যাম্বাসেডর অথবা হালকা নীল ফিয়াট।

উত্তর কলকাতায় ছিল বাড়ির গায়ে বাড়ি, গলির ভেতর তস্য গলি।

বাঙালি মধ্যবিত্ত তখন শহরের কলে লাইন দিয়ে জল তুলত।

সেই ১৯৭০ এর কলকাতা যারা দেখেছি তাদের কাছে এখনকার কলকাতাটাকে যেন মাঝেমাঝে অন্য একটা নতুন শহর মনেহয়। চোখের সামনে যেন একটা আধা গ্রাম দিনে দিনে হয়ে উঠল বিপুল মহানগরী। বদলে গেল শহরের চাল চলন। বদলে গেল শহরের লোকজন।

এখন যখন মাঝেমাঝে গভীর রাতে এই বড়লোক মহানগর নিস্তব্ধ হয়ে যায় তখন শহরের কোনও কানা গলির জীর্ণ পলেস্তরা খসা পাঁচিলে কিংবা সরু সরু আঁকাবাকা রাস্তায় সেই সত্তরের কলকাতার ছায়া পড়ে। সত্তরের না বলা গল্পগুলো বসে থাকে শহরের পুরনো পাঁচিলে, ট্রামলাইনে। ভোর হয়ে গেলে আর সেই পুরনো ছায়া ধরা পড়ে না কারুর চোখে। সূর্যের আলো মুছে দেয় চল্লিশ বছর আগের আশ্চর্য গল্পগুলোকে।

ফোটো: সৌরভ সরকার

(চলবে)

ঘোরাঘুরি @ কলকাতা

ইকো ফ্রেশএয়ার পার্ক

দ্বৈপায়ণ কুণ্ডু

বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে যখন আনন্দনগরীর পারদ চড়ছে রাজনীতি থেকে শেয়ার বাজারে, পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি থেকে প্লাস্টিকের ডিম নিয়ে তোলপাড় সিটি অব জয় ঠিক তখনি রাস্তার ধারের নিম্বু পানি বা পুদিনার সরবতে তিয়াস মিটিয়ে বেরিয়ে পড়তেই পারেন কলকাতার কাছাকাছি কোন বেড়াবার জায়গায়। যেখানকার আকর্ষণীয় মনোরম মুগ্ধতা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও সারা সপ্তাহের অফিসে সেই একঘেয়ে কাজের চাপ, সারাদিনের ক্লান্তি ভুলিয়ে আপনাকে দিতে পারে অপরিমেয় আনন্দ। এমনি একটি জায়গা হল নয়াবাদের ইকো ফ্রেশএয়ার পার্ক।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থিত এই পার্কটি। তিন বিঘা জমির ওপর সুন্দর করে সাজানো। জায়গাটি এতটাই পরিপাটি করে গোছানো যে একবার গেলে আর ফিরে যেতে মন চাইবে না। এই জায়গাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে অসংখ্য গাছপালা, নানা রকম ফুল আর বিশালাকার পুকুর। পুকুরে রয়েছে মাছ আর পুকুরের পাড়ে বসার জন্য বাঁধানো জায়গা করা আছে। পুকুরের মাঝখানে আছে কৃত্রিম আইল্যান্ড। সেখানে বুদ্ধিস্ট প্যাগোডার অনুকরণে তৈরি হয়েছে মন্দির। আর দ্বিতীয় হুগলী সেতুর অনুকরণে তৈরি হয়েছে দুটো ব্রিজ। সব মিলিয়ে জায়গাটিকে অসাধারণ করে তুলেছে এখানকার দূষণমুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। এছাড়া বাড়তি পাওনা হিসাবে বোটিং-এর আকর্ষণও আছে এখানে। ইকো ফ্রেশ এয়ার পার্ক পিকনিক স্পটের ভাড়া একটু বেশি। প্রায় দশ হাজার টাকার কাছাকাছি। ভাড়া একটু বেশি হলে কি হবে এর সাথে একেবারে ফ্রি-তে পাবেন তিনটে রেস্ট রুম। কাছেই সোনারপুর বাজার। পিকনিকের বাকি সাজ সরঞ্জামের জন্য সোনারপুর বাজার থেকে সব কিনে নিজেরাই রান্নার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিংবা পিকনিক করতে এসে হাত পুড়িয়ে নিজেরা রান্না করতে না চাইলে কর্তৃপক্ষকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে ওরাই ক্যাটারিং এর সুন্দর ব্যবস্থা করে রাখতে পারে।

এ তো গেল ইকো ফ্রেশ এয়ার পার্কে ঘুরতে গিয়ে পিকনিকের কথা। কিন্তু কীভাবে যাবেন ভাবছেন! খুব সোজা— শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণ শাখার ট্রেনে সোনারপুর স্টেশনে নেমে ওখান থেকে অটোয় নয়াবাদের দিকে মাত্র ৪ কিলোমিটার এগোলেই প্রায় কলকাতা শহরের লাগোয়া এই ইকো ফ্রেশএয়ার পার্কটি পড়ে। এছাড়া রুবি হাসপাতাল থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে এই পার্ক। বাস বা নিজস্ব গাড়িতেও যেতে পারেন। রুবি হাসপাতালের পাশ দিয়ে মেঘনাথ সাহা কলেজ হয়ে খেয়াদহ উচ্চ বিদ্যালয়কে ডানদিকে রেখে ৪ কিলোমিটার এগোলেই তিহুরিয়া নয়াবাদে পড়ে এই এয়ার পার্ক।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

মেসবাড়ি অস্ত গিয়ে শহরের বুকে ‘পিজিদয়’

সুদীপ্ত বিশ্বাস

পুরনো কলকাতা। বৃষ্টিভেজা রাস্তা।

ট্রাম। কফি হাউস। রাইটার্স বিল্ডিং।

শহর চষে পাঞ্জাবির পকেটে শেষ চারমিনার বাঁচিয়ে ঘরে ফেরা। নিজের ঘর না থাকলে মেসবাড়ি!

কাঠের সদর দরজা। তাতে লোহার খিল। দরজা খুললেই উঠোন। সেখানে একটা বড় শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চা। ওই জলেই স্নান। ওই জলেই বাসন ধোয়া। উঠোনটা জলকাদা মাখানো। উঠোনের একপাশে বড় রান্নাঘর। মাটির উনুনে কালি মাখা বিশাল কড়া বসানো। খালি গায়ে খুন্তি নেড়ে চলেছেন ভুঁড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক।

গোটা বাড়িতে খান দশেক ঘর। প্রত্যেক ঘরে তিন থেকে চারটে চৌকি। একটা টেবিল। একটা হ্যাঙার। তাতে সবার জামা-প্যান্ট ঝোলানো। গোটা দেওয়াল জুড়ে আঁকিবুকি। দু’চার লাইন লেখা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হই-হট্টগোল। যেন কাক-চিল বসছে। পাশের বাড়ি থেকে নিয়ম করে নালিশ। সন্ধ্যাবেলায় মেস মালিকের কাছে ঝাড়। তার পরের দিন যা কে সেই! পাশে যদি মেয়েদের মেস থাকে তো পোয়াবারো। ‘সপ্তপদী’র ‘এবার কালি তোমায় খাবো’র রিপিট। একবার নয়, বারবার।

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কলকাতার নস্টালজিয়া মেসবাড়ি। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ থেকে ‘বসন্তবিলাপ’। বাংলা সিনেমাতে ব্যাচেলরদের দেখাতে পরিচালকরা গল্পের মধ্যে মেসবাড়িকে দেখিয়েছেন। বসন্তবিলাপে কীভাবে দুটো মেসবাড়ির মধ্যে ঝামেলা বলুন তো! সেখান থেকে প্রেম। কলকাতায় এই রকম কত ‘বসন্তবিলাপ’ ঘটে গেছে, কে জানে! কোনও হিসাব নেই। সেই মেসবাড়ি এখন অস্ত গেছে। দোতলা বাস যেমন শহরের বুকে আর নেই, তেমন মেসবাড়িও নেই।

রমাকান্তবাবু পঁচিশ বছর পর ফিরলেন কলকাতায়। শ্যামবাজারে বোনের বাড়িতে উঠছেন। আগে কলকাতাতে থাকতেন। সে বহু বছর আগে। মেসে থাকতেন। নিজের বাড়ি বর্ধমানে। তারপর চাকরিজীবন দিল্লিতে। বয়স সাতান্ন হলেও স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। বেশ টেকস্যাভিও। এয়ারপোর্ট থেকে শ্যামবাজার ওলা বুক করে এসেছেন। এয়ার ইন্ডিয়া থেকে নেমে এফবি-তে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দু’পাশে ছাদ দেখতে গিয়ে রমাকান্তবাবুর ঘাড় বড্ড ব্যথা। যে-শহরে স্ত্রীকে প্রথম দেখেছিলেন, সেই শহরের হাওয়ায় প্রেমের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেনও বটে। গন্ধ নেই। বদলে রমাকান্তবাবুকে স্বাগত জানায় ধুলো। কাচ নামিয়ে দেন। কলকাতায় আসা ছেলের জন্য। এখানে পড়াশোনা করবে। একটা ভালো মেসের ব্যবস্থা করে দিয়ে দিল্লি ফিরে যাবেন। রমাকান্তবাবু মেসবাড়ির গল্প দিল্লিতে অনেককে শুনিয়েছেন। সাতদিন পর ফিরে গেলেন দিল্লি। ছেলের জন্য মেস খুঁজে পেলেন না। পিজি (পড়ুন পেয়িং গেস্ট) পেয়েছেন। ফিরে এসে ফেসবুকে লম্বা পোস্ট। মাথায় লিখলেন ‘মেস হল পিজি’, সুবল দা’রা হলেন দালাল।

পোস্টটা ছিল এরকম:

বন্ধুরা, গতকাল রাতে ফিরলাম। আমার আগের শহরে গিয়েছিলাম। কলকাতায়। আমি বদলেছি। ভুঁড়ি বেড়েছে। চোখটাও ভালো নয়।

কলকাতাও বদলেছে। বাড়ি বেড়েছে। গাড়ি বেড়েছে। লোক বেড়েছে। কফি হাউসটাও। আর, দিল্লির পরিচিত বাঙালিদের আমার সাধের মেসবাড়ির যে গল্প শুনিয়েছিলাম, তাও ইতিহাস হয়ে গেছে।

কলকাতায় মেসবাড়ি বলে আর কিছু নেই। গিয়েছিলাম ছেলের জন্য। ওখানে পড়াশোনা করবে। থাকার একটা জায়গা চাই। ভেবেছিলাম ভালো মেস ঠিক করে দেব। আর মেস! মেস কোথায় রয়েছে? এক ভদ্রলোক পাশ থেকে বলল— চাই? আমি জানি। চলুন নিয়ে যাচ্ছি। ওঁর সঙ্গে কিছুটা যাওয়ার পরেই বলল, দাদা, একমাসের অ্যাডভান্স লাগবে কিন্তু। বুঝলাম, দালাল। সোজা বলে দিলাম, লাগবে না। ও চলে গেল। একটা সিগারেটের দোকানে জিগ্যেস করলাম। দোকানের বউটাও হঠাৎ করে দালাল বনে গেল। রাস্তায় একটা মাঝবয়সি লোককে বললাম। সেও অ্যাডভান্স চেয়ে বসল। অবাক হলাম। উপায় না দেখে, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই একটা বাড়িতে গেলাম। তিনতলা বাড়ি। মাঝের তলায় মালিক থাকে। বাকি দুটোয় পিজি। বাড়ি, কিন্তু দেখতে অনেকটা ফ্ল্যাটের মতো। একটা ঘরে চারটে চৌকি। মালিক বলল, একটা বেড ফাঁকা রয়েছে। দু’হাজার করে লাগবে। জিগ্যেস করলাম, খাওয়া? বলল, ব্যবস্থা নেই। লোক রয়েছে। বললে তিন বেলা খাবার দিয়ে যাবে। মানে হোম সার্ভিস। আমার কাছে মেসের সংজ্ঞাটা তখনই বদলে গিয়েছিল।

যে ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম তাকে বললাম অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে। তার বেশি চেনা নেই। ‘ইনস্ট্যান্ট দালাল’ হয়েছিল। কাকে ফোন করল একটা! কথা শুনে মনে হল ‘রিয়াল দালাল’। আমাকে তার ফোন নম্বর দিয়ে চলে গেল। আমি তার সঙ্গে কথা বলে একটা বাড়িতে গেলাম। সেটা পাঁচতলা ফ্ল্যাট। পুরোটাতেই বেড সিস্টেম। একটু চকচকে বলে বেড পিছু তিন হাজার। ঘরে ঢুকে দেখলাম- দুটো বেড। টিভি রয়েছে। হ্যাঁ, এটা বলা হয়নি। বেড মানে চৌকি। ওটা আগের মতো। বদলায়নি। ঘর দেখে বুঝলাম যারা থাকে তারা প্রাইভেসি বজায় রেখে চলে। পাশের বেডের ছেলের সঙ্গে গলায় গলায় মেশে না। বেড়ে বসে থাকা একজনকে নাম জিগ্যেস করলাম, নাম বলল। পাশের ছেলের কথা জিগ্যেস করতে বলল, নামটা জটিল। মনে নেই। রুমমেট ছেড়ে দেবে।

এরকম অনেক বাড়ি এরকম দেখলাম। প্রথমে যাদবপুর।

দিল্লির মতো ওখানেও পিজি। কিছু মেস রয়েছে বটে। সেগুলো নামেই মেস। মেসের ‘ম’ নেই তার মধ্যে। পরিবর্তনটা অনেকদিন এসেছে। আমিই পিছিয়েছিলাম। উত্তর কলকাতার মেসবাড়িগুলো আর নেই। ভেঙেচুরে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। যেগুলো অবশিষ্ট রয়েছে তারা ভাড়া দেয়। আবার ব্যাচেলার ভাড়ায় আপত্তি!

প্রথমে যাদবপুর প্রসঙ্গে আসি। বাইরে থেকে যারা পড়শোনা বা চাকরির জন্য কলকাতায় আসে, তাদের একটা বড় অংশ থাকে যাদবপুরে। প্রথমে সেখানেই গিয়েছিলাম। এইটবি থেকে ডানদিকে ঢোকার পর যে গলিতেই আপনি ঢুকবেন না কেন দোতালা বাড়ি। দেখে মনে হল একতলায় থাকে বাড়ির মালিক। আর একতলা পিজি। একটা চায়ের দোকানে চা খেতে গেলাম। ভাঁড়টা নিয়ে দোকানদারকে জিগ্যেস করলাম এখানে তারপর দমদম। গড়িয়া, সব জায়গায়। মেসের কোনও গন্ধ পেলাম না। কলকাতার ছাত্রজীবন বদলে গেছে। তারা একসঙ্গে নয়, এখন একা থাকতে পছন্দ করে। পাশের ছেলেটাকে রুমমেট বলে। রাতে আড্ডা নয়, স্মার্টফোনকে বন্ধু বানিয়ে নেয়। বিছানায় একপাশ হয়ে ফেসবুকে বন্ধু বানায়। পাশের ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।

আমাদের সময়টা আলাদা ছিল। মেসবাড়ি শুধু বাড়ি ছিল না। ছাত্রজীবন থেকে চাকরিজীবনে যাওয়ার একটা সেতু ছিল। কলকাতা থেকে ফিরে মনটা একটু খারাপ। ছেলেও বলল, সবার সঙ্গে থাকতে পারব না। আলাদা থাকব। তাই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। ছেলে ওখানেই থেকে পড়াশোনা করবে।

ফেসবুকে পোস্ট করে রমাকান্তবাবু স্ত্রীকে বললেন— এখন মুখ্যমন্ত্রী রাইটার্সে নয়, নবান্নতে বসেন। ওটাও বদলে গেছে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

কলকাতার মিষ্টি

নীলিমা বিশ্বাস

বাঙালির সঙ্গে একটি জিনিসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেটি হল মিষ্টি। খাওয়ার শেষপাতে যদি একখানি মিষ্টি থাকে তাহলে আপামর বাঙালির রসনা-বাসনা দুটোই তৃপ্ত হয়। বাঙালির কাছে মিষ্টি যেন এক অমৃতকুম্ভ, যার কোনও বিকল্প হয় না। মিষ্টিপ্রেমী বাঙালি অবলীলায় দাবি করেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার থেকে নবীনচন্দ্র দাসের রসগোল্লা আবিষ্কার কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পৃথিবীর যে প্রান্তে বাঙালি আছে সেখানেই মিষ্টির প্রতি প্রেম চিরন্তন হয়ে আছে। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে আছে মিষ্টির প্রতি বাঙালির ভালোবাসার প্রমাণ। তাই যতই বাঙালির খাদ্য তালিকায় যোগ হোক চিনা, ইতালি বা আমেরিকান স্বাদ কিংবা অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ফলে দেহের মধ্যপ্রদেশীয় অংশের যতই বৃদ্ধি ঘটুক না কেন তবুও বাঙালির মিষ্টির প্রতি টান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পেরিয়ে অবিচল। অবিচল রয়েছে শুধু নয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কলকাতার মিষ্টির মানচিত্র আঁকতে গেলে উত্তর কলকাতার পাল্লা অবশ্যই ভারী হয়ে উঠবে। প্রথমেই যে নামটি মনে আসে সেটি হল ভীমচন্দ্র নাগ। কলকাতার ভৌগোলিক পরিচয়ে গঙ্গা নদী যতটা উল্লেখযোগ্য, রসনার পরিচয়ে সেইরকমই এদের সন্দেশ ততটাই উল্লেখযোগ্য।

কড়াপাকের সন্দেশের মহারাজ ভীম নাগের সন্দেশ তাদের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছে। সময়টা ১৮২৬ সাল। গঙ্গার অপর পাড় হুগলি জেলার জন্যই নামের এক গ্রাম থেকে কলকাতার বড়বাজারে একটি ছোট্ট মিষ্টির দোকান খুললেন ময়রা প্রাণচন্দ্র নাগ। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি তাঁর ছেলে ভীমচন্দ্র নাগ সন্দেশ শিল্পকে নিয়ে গেলেন এক অন্য উচ্চতায়। জায়গা করে নিলেন ইতিহাসের পাতায়। শোনা যায়, বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভীম নাগের সন্দেশ না খেয়ে রাতে ঘুমোতে যেতেন না। রানি রাসমণির বাড়িতে যে কোনও উৎসবে ভীম নাগের কড়া পাকের সন্দেশ ছিল একটি আবশ্যিক মিষ্টি।

ইতিহাসের পাতায় আরও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন রায়ও ছিলেন ভীম নাগের সন্দেশের ভক্ত। ভীমচন্দ্র নাগের সেই দোকান আজ বউবাজারে বাঙালি জাতির মিষ্টির প্রতি ভালোবাসার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

এ তো গেল কড়া পাকের সন্দেশের কথা। এবার আসি কলকাতার নরম পাকের সন্দেশের গল্পে। নরম এই সন্দেশ মুখে পুড়লে মনে হয় শুধুমাত্র একটিবার এই স্বাদ পাবার জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই বাংলায় ফিরে ফিরে আসা যায়।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ছানার সঙ্গেই চিনি মিশিয়ে তৈরি হয়েছিল সন্দেশ। সাল-তারিখ সঠিকভাবে জানতে পারা না গেলেও মনে করা যেতেই পারে সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল নরম পাকের সন্দেশের পথ চলা। যার প্রথম নামটি ছিল 'মাখা সন্দেশ'।

১৮৪৪ সালে গিরিশচন্দ্র দে আর নকুরচন্দ্র নন্দী মিলে কলকাতার হেদুয়ার কাছে রামদুলাল স্ট্রিটে তৈরি করেন একটি মিষ্টির দোকান। সেই সময় থেকেই এরা জলভরা, কাঁচাগোল্লা, শঙ্খ সন্দেশ পরিবেশন করে বাঙালির রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছেন। নরম পাকের সন্দেশের এই দোকান কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও সেরা। বিবেকানন্দ থেকে সত্যজিৎ রায় অথবা অমিতাভ থেকে অভিষেক বচ্চন সকলেই নকুরের মিষ্টির ভক্ত।

হুগলির কৃপারাম মোদক। কলকাতার উত্তরপ্রান্তে চিৎপুর রোডের ধারে বাগবাজারে এসে তিনি মিষ্টির দোকান দিলেন। সে দোকানের উত্তরসূরি ছিলেন ভোলানাথ মোদক। তিনি আবার শুধু মিষ্টির রস নয়, কাব্যরসেরও অধিকারী। ১৮৫১, কলকাতার ইতিহাসের পাতায় নজর রাখলে দেখা যাবে কবিয়াল ভোলা ময়রার নাম। যাঁর কাছে কবিগান শিখতে এসেছিলেন পর্তুগিজ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। বাগবাজারেই ছিল এই ভোলা ময়রার দোকান।

পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টির জগতে দ্বারিক ঘোষ নামটি সুবর্ণ অক্ষরে লেখা আছে। ১৮৮৫ সালে তিনি কলকাতায় তার প্রথম দোকানটি উদ্বোধন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সন্দেশ, প্যাঁরা— এসবের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। বর্তমানে সারা কলকাতায় এই গোষ্ঠীর ৯টি দোকান আছে।

সন্দেশের পরেই আসে রসগোল্লার কথা। রসনা তৃপ্তির সমস্ত রস নিজের অন্তরের মধ্যে লালন করে রসগোল্লা যুগ যুগ ধরে বাঙালিকে তৃপ্ত করে আসছে। আর রসগোল্লার কথা উঠলেই মনে আসে মধ্য কলকাতার কে সি দাসের দোকানের কথা। পাঁচ পুরুষ ধরে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় এই দোকানটি অবস্থিত। রসগোল্লার আবিষ্কারক নবীনচন্দ্র দাস এই দোকান তৈরি করেন। ঐতিহ্যবাহী রসগোল্লার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহন, রাজভোগ রয়্যাল, অমৃতকুম্ভ, রসমালঞ্চ, ছানার টোস্ট শুধু কলকাতা বা ভারতে নয় গোটা বিশ্বে বিখ্যাত। এছাড়াও কলকাতায় আরও আছে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এদের বিখ্যাত চিত্রকূট কলকাতার বহু বিয়েতে বর এবং কনে পক্ষকে তত্ত্ব হিসাবে পাঠানো হয়।

এবার আসা যাক দক্ষিণ কলকাতায়, ভবানীপুরের বিখ্যাত মিষ্টির দোকান বলরাম মল্লিক এবং রাধারমণ মল্লিকের কথায়। প্রাণহারা সন্দেশের জন্য বিখ্যাত এই দোকান। গুণমানের বিচারে এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে কলকাতার প্রথম সারির দোকানগুলি যথেষ্ট উন্নত। বলরাম মল্লিকের পাকশালায় কাজ করে একটি জাপানি রোবট। যে নয় নয় করেও ৯৯ ধরনের মিষ্টি তৈরি করতে পারে। প্রাণহারা সন্দেশ তৈরিতে এই রোবট কারিগরের জুড়ি মেলা ভার।

এছাড়া আছে দক্ষিণ কলকাতার বাঞ্ছারাম। এদের বিখ্যাত মিষ্টি 'আবার খাবো'। আছে যুগলকিশোর ঘোষের প্রতিষ্ঠিত 'যুগলস সুইটস', যুগলস-এর মিষ্টি দই। সঙ্গে আছে ছানার জিলিপি এবং কাঁচাগোল্লা যা খুবই বিখ্যাত। গাঙ্গুরামের রাবড়ি আর মিষ্টি দইয়ের কথা না বললে অনেকটাই না বলা থেকে যায়।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি তৈরির ভাবনায় এসেছে পরিবর্তন। সময়ের চাকায় কল্লোলিনী কলকাতা হয়ে উঠেছে প্রাসাদ নগরী। ব্যবহার হচ্ছে আধুনিক যন্ত্র, রোবট। গুণমান বজায় রাখতে কলকাতার প্রথম সারির মিষ্টির দোকানগুলির কারখানায় বসেছে গুণমান পরীক্ষা করার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। এছাড়াও চলছে স্বাদ এবং গন্ধ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা।

দক্ষিণ গোলার্ধের মিষ্টির সঙ্গে যোগ হয়েছে উত্তরের স্বাদ। আর প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের মিলনে কড়াপাক আর নরম পাকের সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চকোলেটের মিশ্রণ, যা একটা নতুন স্বাদ যোগ করেছে কলকাতার মিষ্টিতে।

তবে এই সন্দেশের এই নতুন স্বাদ নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু শেষ কথা বলেছে জনগণ। সাদরে গ্রহণ করেছে চকোলেট সন্দেশ। আর এটাই কলকাতার মিষ্টির জগতে নবতম সংযোজন। যদিও এর আগেই দই এবং সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আম থেকে আনারস নানা রকম ফলের স্বাদ।

এবার নজর রাখা যাক মিষ্টির ব্যবসার দিকে। কৌটোতে ভরে কে সি দাসের রসগোল্লা অনেকদিন আগেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলে যাচ্ছে কলকাতার এই সব দোকানগুলির মিষ্টি। তবে ১৯৬০ সালে সম্ভবত প্রথম সোভিয়েত রাশিয়ার মন্ত্রীসভায় হাজির হয় সন্দেশ। রাশিয়ায় যাকে অভিহিত করা হয়েছিল 'বাঙালির বিস্ময়' নামে।

বেঙ্গল সুইটমিট মেকারস অ্যাসোসিয়েশন-এর তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় এদের ১ লক্ষের আশেপাশে সদস্য আছে এবং এদের ব্যবসা যোগ করলে যেটা দাঁড়ায় সেটা প্রায় ৬০ বিলিয়ন টাকা। এছাড়াও গোটা পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক মিষ্টির দোকান আছে যারা এদের সদস্য নয়। সেই ব্যবসাটা হিসাবের মধ্যে আনলে হয়তো অঙ্কটা ১০০ বিলিয়ন টাকাকে ছাড়িয়ে যাবে।

রানাঘাট, নবদ্বীপ, বনগাঁ সহ ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে ছানা প্রতিদিন কলকাতায় আসে। আর সেই ছানা থেকেই তৈরি হয় সুস্বাদু সব মিষ্টি। যুগ যুগ ধরে যা বাঙালিকে অমৃত-স্বাদে মাতোয়ারা রেখেছে।

তথ্য @ কলকাতা

রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফতরের ওয়েবসাইট

- **রাজ্য সরকার**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.banglarmukh.com**)
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর**, জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ এন এস রোড, কলকাতা-১ (**www.wbprd.nic.in**)
- **অর্থ দফতর**, নবান্ন, হাওড়া -৭১১১০২ (**www.wbfin.nic.in**)
- **স্বাস্থ্য দফতর**, স্বাস্থ্য ভবন, জিএন-২৯, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbhealth.gov.in**)
- **পরিবেশ দফতর** (**www.enviswb.gov.in**)
- **পূর্ত দফতর** (**www.pwdwb.in**)
- **পরিবহন দফতর**, পরিবহন ভবন, ১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-১ (**www.vahan.wb.nic.in**)
- **কৃষি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.wbagrisnet.gov.in**)
- **সেচ দফতর**, জলসম্পদ ভবন, ব্লক-ডিএফ, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbiwd.gov.in**)
- **সমবায় দফতর** (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.coopwb.org**)
- **মৎস্য দফতর**, ৩১, ব্লক-জিএন, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbfisheries.gov.in**)
- **প্রাণী সম্পদ দফতর**, এলবি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbard.gov.in**)
- **খাদ্য দফতর**, খাদ্য ভবন, ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭ (**www.wbfood.gov.in**)
- **শিক্ষা দফতর**, বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsed.gov.in**)
- **তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর**, নবান্ন, হাওড়া-৭১১১০২ (**www.tathyabangla.gov.in**)
- **যুব কল্যাণ দফতর**, ৩২/১ বিবিডি বাগ (সাউথ), স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-১ (**www.wbyouthservices.in**)
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দফতর**, বিকাশ ভবন, নর্থ ব্লক, দশম তল, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbsc.gov.in**)
- **বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর** (**www.wbdma.gov.in**)
- **ক্ষুদ্র শিল্প দফতর** (**www.mssewb.org**)
- **বিদ্যুৎ দফতর**, বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbpower.nic.in**)
- **অচিরাচরিত শক্তি দফতর**, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১ (**www.wbreda.org**)
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর**, অম্বর, ডিডি-২৭/ই, সেক্টর ১, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.wbmdfc.org**)
- **অনগ্রসর কল্যাণ দফতর**, প্রশাসনিক ভবন, এসডিও বিধাননগর, চতুর্থ তল, ডিজে-৪, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৯১ (**www.anagrasarkalyan.gov.in**)

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, তনুশ্রী দাস, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত, শিবানী দাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুদীপ্ত চৌধুরী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী, অতনু পাল** (ফোটোগ্রাফার)

বিতর্কিত চরিত্র

তুষারকান্তি রায়

ছত্রিশ বছর বয়সি মা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বিছানায় শুয়ে বালকটি প্রার্থনা করেছিলেন, ‘ভগবান, তুমি থাকলে মা বেঁচে যাবেন।’ কিন্তু ভোরবেলায় মা মারা গেলে তিনি আর ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাননি। যিনি ৭১ বছরের জীবনে কাব্যসাধনা করেন মাত্র ১২ বছর, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। অথচ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থকে সম্বল করেই বাংলা কবিতার এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। গদ্য কবিতার অসামান্য সাফল্যের পরেও যিনি স্বেচ্ছাবসর নিয়েছিলেন, রুশ-বাংলা অনুবাদের কাজ যাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ায়, দেশে ফিরে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ধীমান সাংবাদিক, আড্ডাধারী সামাজিক হিসাবে বিদ্যা ও বুদ্ধিজীবী সামাজিকদের লক্ষ্য করেছেন ঈষৎ অলক্ষে থেকে, ব্যঙ্গে-বিদূষণে এক অলক্ষিত গোপন বেদনায় নিজের জীবন ও সময় নিয়ে যিনি এক নকশা এঁকেছেন তিনি হলেন সমর সেন।

বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনের প্রখ্যাত নগেন বসুর বাড়ির লাগোয়া তিনতলা বাড়ির একান্নবর্তী সেন পরিবারে ১৯১৬ সালে তাঁর জন্ম। বাবা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। ঠাকুরদা দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। পড়াশোনার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে ঠাকুরদা তাঁকে একটু বেশিই স্নেহ করতেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনাও যথেষ্ট সরস ছিল। নাতির সাহিত্যচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা উঠলে তিনি বলতেন, তুই একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।’ তাঁর মায়ের দাদামশাইকে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিষবৃক্ষ’ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মায়ের জীবদ্দশায় শ্যামপার্কের ভাড়াবাড়িতে মাঝেমাঝেই আসতেন কাজী নজরুল ইসলাম। আসতেন জসিমউদ্দিন, আব্বাসউদ্দিন আরও অনেকে। তাঁর বাবা আদি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মা-বাবার ঘনিষ্ঠতা, পত্রালাপ ছিল অনেকদিন।

১৯৩৮-এ এমএ পাশ করে কিছুদিন দোটানার মধ্যে ছিলেন সমর সেন। আগের বছর নির্বাচনে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আসানসোল গিয়ে সক্রিয় রাজনীতির কথা ভেবেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু গভীর ভাবনার পর ঠিক করলেন সক্রিয় রাজনীতি তাঁর দ্বারা হবে না। বক্তৃতা তাঁর আসে না, তার চেয়ে বিপ্লবী কবিতা লিখে এবং পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেকের দংশন হবে না। তাছাড়া তাঁকে কর্মী হিসাবে পেলে পার্টির বিশেষ লাভ হবে বলে তাঁর মনে হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি পেয়ে মনের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে দু’বছর সময় কাটিয়ে দিলেন। বৃত্তির মেয়াদ ফুরিয়ে আসতে তাঁকে চাকরির চেষ্টা করতে হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খবর দিলেন আশুতোষ কলেজে দরখাস্ত করলে চাকরি হয়ে যাবে। কিন্তু ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত তাঁর লেখা কবিতা অশ্লীল বিবেচিত হওয়ায় বোর্ডের লোকেরা তাঁকে বাতিল করলেন। চাকরি হল না। শেষ পর্যন্ত কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে ১০০ টাকা বেতনের চাকরিতে ঢুকলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁর হাবভাব গতিবিধি দেখে বলতেন— এখানে বেশিদিন টিকবে না।

১৯৪০-এ কাঁথি থেকে কলকাতা এলেন। ১৯৪১-এর এপ্রিলের শেষে বিয়ে হল সুলেখা দেবীর সঙ্গে। বিয়েতে তাঁর বাবার মত ছিল না। কেননা পাত্রের দিদিমা ও সুলেখাদেবীর ঠাকুমা ছিলেন সহোদরা। যদিও বিয়েতে তিনি

এসেছিলেন। বরপণে তাঁর আগ্রহ থাকলেও পাত্রের আপত্তি থাকায় বউভাত হল না। বিয়ের পর ভাড়া বাড়িতে আর একটা বড় ঘর সহ সামনের ছোট্ট বাগানটি পাওয়া গেলেও অনেক লোকজন এলে দুই কন্যা সহ তাঁর স্ত্রীকে বাপের পিত্রালয়েই রাত কাটাতে হতো। কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করে ১৯৪৪-এ একটি বিজ্ঞাপনী অফিসে দিন সাতেক কাজ করে চলে যান দিল্লি। সেখানে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র সংবাদ বিভাগে পাঁচ বছর কাটে।

১৯৪৯-এ নভেম্বরের শেষদিকে কলকাতায় এলেন । যোগ দিলেন ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সংবাদ সম্পাদনা বিভাগে। সালটা ১৯৫৭, মস্কোর ‘বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনালয়’ সংস্থায় চাকরি নিয়ে সপরিবারে উঠলেন সেখানে। সাড়ে চার বছর পর আবার কলকাতার একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় সাত মাস, তারপর একটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদকের পদে যোগ দিলেন। ১৯৬৪-তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশন নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে চাকরি ছেড়ে দিলেন।

শুরু হল নতুন অধ্যায়। ১৯৬৪-তে ‘NOW’ পত্রিকার সম্পাদনার ভার পেলেন। ‘NOW’ থেকে বিতাড়িত হবার দু-সপ্তাহ পরে নতুন পত্রিকার প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং ১৯৬৮-র ১৪ এপ্রিল নববর্ষে প্রকাশিত হল ‘ফ্রন্টিয়ার’। গৌরবোজ্জ্বল আর বিতর্কিত অধ্যায় পেরিয়ে যেতে যেতে ১৯৭৬-এর মার্চে সরকারের নির্দেশে ‘ফ্রন্টিয়ার’ ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে।

ত্রিশ থেকে আশির দশকের অন্তর্বর্তী পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, তার সঙ্গে স্বপ্ন-সাফল্য-ব্যর্থতা-দাঙ্গা ও প্রগতি আন্দোলন, স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর আশা-নিরাশার সমন্বয়ে কলকাতার সমর সেন এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

ইট-কাঠ-পাথরের গল্প

পান্থজন

দুগ্ধজাত দ্রব্যের দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে পথ আমাকে যে কঠিনতা দেখাল, তাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগের এক গল্প। ক্রমে ক্রমে সেই বার্তা রটে গেল যে, গণেশ বাবাজি দুধ খাচ্ছেন। শুনে ভেবেছিলাম, মাটির গণেশ, কিন্তু নাহ্ পরে জানলাম পাথরের গণেশ। কিম আশ্চর্যম! পাথরের গণেশ দুধ খাচ্ছে কীভাবে? আচ্ছা, লোকমুখে যে শোনা যায় অমুক জায়গার অমুক দেবতা খুব জাগ্রত, যা চাওয়া যায় তাই তিনি দেন। তাহলে ধরে নেওয়া উচিত হবে কি এইসব জাগ্রত দেবতারা মাঝে মাঝেই ভক্তের দেওয়া জিনিস খান? থুড়ি, ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ারকি মারা উচিত নয়। আসলে আমার আশপাশে এখন শুধুই পাথর। তাই গণেশের কথাটা মনে পড়ে গেল।

পাথর নামক শব্দটি কতবার যে কত জায়গায় কত রকমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা বলার নয়। কতবার শুনেছি ক্ষমতা থাকলে পাথর থেকেও জল বেরোয়, কিংবা পাথরের মতো হৃদয় ইত্যাদি কথা। পাথরের প্রতিশব্দ পাষাণ। তাই নিয়ে অনেক গান কবিতাও শোনা গেছে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান ‘আমি চলে গেলে পাষাণের বুকে লিখ না আমার নাম’ অথবা ‘পূজারিণী’র সেই লাইন ‘সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা...’ এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই পাথরের তৈরি নানা অবয়ব চোখের সামনে চলে এল। বুঝতেই পারছেন চিৎপুরের পাথরের এলাকায় চলে এসেছি। পিচ গলানো রাস্তার দুই ধারে চলেছে পাথরের ব্যবসা।

এসব দোকানে আকৃতিহীন পাথর যেমন আছে, তেমনই কেনাবেচা চলেছে পাথরের মূর্তি। শ্বেতশুভ্র পাথরে গড়ে উঠছে শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, কালী, দুর্গা, লোকনাথ, রাধাকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন দেবদেবী ও সাধকের মূর্তি। পাশাপাশি রয়েছে কালো পাথরের ব্যবহারও। এঁদেরই ভিড়ে মিশে আছেন নেতাজি, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশিষ্ট মনীষীরা। পোটপাড়া বা কুমোরটুলির মতো মরশুমি ব্যবসা এঁদের নয়। এদের ব্যবসা বাৎসরিক। সারা বছরই এঁদের দোকানগুলিতে ক্রেতাদের যাতায়াত। স্থানীয় বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল কোনও কোনও মূর্তি গড়া হয় বরাত অনুযায়ী, আবার অন্যগুলো বিশেষ অর্ডার ছাড়াই বিক্রির আশায় সাজিয়ে রাখা রয়েছে। প্রতিটি দাম এবং সাইজ ভিন্ন। সব মিলিয়ে এ রাস্তার ওপরই ৫০টির মতো দোকান রয়েছে।

দেব-দেবীর বৈচিত্রময় রূপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলি আরেক বৈচিত্রের দিকে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে চৈত্রের রোদে ঘামছি, সেখানে রয়েছে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকা। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে জোড়াসাঁকো রায়বাড়ি। দেওয়ালে আঁটা পাথরের লিখন সেরকমই সাক্ষ্য দিচ্ছে। রায় পরিবারের অধীনে থাকা বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণ একরকম। ভিতরে ঢুকলে বোঝা যায় তিন খিলানের ঠাকুরদালানের একপাশে রয়েছে ভাড়াটিয়া। সেখানে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্য। সামনের অংশে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ। বাড়ির চারটি বারান্দা, কাস্ট আয়রন রেলিং এবং কাঠের কাজে সুসজ্জিত। রায়বাড়ি থেকে এক পা এগোলেই বিশাল তোরণ। তোরণের নীচ দিয়ে চলে গেছে দ্বারকানাথের নামাঙ্কিত সর্পিল গলি। সেই গলির শেষ প্রান্তে আছে বাঙালির ভাবাবেগ ও ভালোবাসা যাঁকে ঘিরে, সেই বিশ্বকবির আবাস আর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি।

এই চত্বরে থাকার কথা ছিল চারটি বাড়ির, কিন্তু বর্তমানে রয়েছে তিনটি। বাঁয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত লালবাড়ি বা বিচিত্রা ভবন, নাক বরাবর মহর্ষি ভবন, আর পিছন দিকে অবন-গগন ঠাকুরদের বাড়ি। তবে মূল বাড়িটি অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ‘দক্ষিণের বারান্দা’ যে বাড়িতে ছিল, সেটির আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই। অনেকদিন আগেই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সেখানে তৈরি হয়েছে রথীন্দ্র মঞ্চ। এই বাড়িগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানাতেও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। সামনেই বাঙালির তেরো পার্বণের অন্যতম রবীন্দ্র জন্মোৎসব। তাই ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু করব ২৫ বৈশাখের প্রাক্কালে।

জোড়াসাঁকো রায়বাড়ির ঠাকুরদালান

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলেশনশিপ

তন্ময় মণ্ডল

দিন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় অনেক কিছুই, সেই রীতি মেনেই সময়ের রং ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে সম্পর্কের সংজ্ঞা, সম্পর্কের পরিকাঠামো। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরা দিয়েছে তালুবন্দি ছোট্ট মোবাইল ফোনে। 'ও রামুর মা, তোমার ছেলের চিঠি এসেছে!'... সেদিন আজ অতীত। কলকাতায় চাকরি করা রামুকে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আর চিঠি লিখতে হয় না।

প্রযুক্তির অগ্রগতি মোবাইল নামক যন্ত্রটিতে যুক্ত করেছে ইন্টারনেটের সুবিধা। ফলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপ, ইমো, ভাইবারের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে আজ মুখোমুখি বসে কথা বলতে পারা যায় মহাবিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে মাজন লাগানোর আগে আধো আধো ঘুম চোখেই এ-যুগের ইয়ং জেনারেশনের প্রায় প্রত্যেকেরই অভ্যাস মোবাইলের নোটিফিকেশন চেক করা। আমরা এই অ্যান্ড্রয়েড সাম্রাজ্যের বাসিন্দারা ক্রমশ সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে নিমেষে পাতিয়ে ফেলছি নতুন বন্ধুত্ব, চোখের পলকে কোনও অচেনা মানুষের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি সম্পর্কের হাতছানি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সোশ্যাল মিডিয়ায় গড়ে ওঠা সম্পর্কের বাঁধন কতটা শক্ত হয়? আদতে নিমেষে সম্পর্ক তৈরি এবং মুহূর্তে ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক আমাদের রিয়েল লাইফে কতটা প্রভাব ফেলছে? ভার্চুয়াল সম্পর্কে একটা মানুষকে কতটুকুই-বা জানা সম্ভব?

তবে এক্ষেত্রে বহু ভার্চুয়াল সম্পর্কই রিয়াল লাইফে এগজিস্ট করে। অনেক ভালো ভালো সম্পর্কই গড়ে ওঠে এই সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায়। এমনকী বহু সম্পর্ক হয়তো রক্তের সম্পর্কের চাইতেও বেশি হয়ে ওঠে। বহু ডিপ্রেসড মানুষ ক্ষণিকের আলাপচারিতায় কখনও কখনও সাময়িকভাবে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। আবার এর বিপরীত ঘটনার উদাহরণও প্রচুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় গড়ে ওঠা অসমবয়সি প্রেম, অনৈতিক সম্পর্ক, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলছে। বহু মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে প্রতিহিংসা নেওয়ার উদাহরণও ভুরিভুরি।

সবচেয়ে বড় কথা হল এই ভার্চুয়াল জগতে বিচরণের অভ্যেস আমাদের বাস্তবিক জীবনে কোনও খারাপ প্রভাব ফেলছে না তো? ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ আমাদের রিয়াল লাইফের কাছের মানুষগুলোর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে না তো? এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই আজ আমি পৌঁছে গেছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে।

জয়ন্ত হালদার (ছাত্র): সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক রিলেশনশিপ তৈরি হয়, আবার অনেক রিলেশনশিপ ভেঙেও যায়। আমি আমার কথা যদি বলি, তবে বলতে হবে আমি মারাত্মকভাবে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকটেড। আমার প্রচুর বন্ধু আছে যাদের সঙ্গে কখনও দেখাই হয়নি, অথচ তাদের কোনও খুশির খবর পেলে আমিও খুশি হই। দুঃখের খবর পেলে আমিও দুঃখ পাই। অনেক সম্পর্ক তো খানিকটা আত্মীয়তার পর্যায়েই চলে গেছে। খারাপ দিকের কথা যদি বলতে হয়, তবে বলতে হবে, সবকিছুরই খারাপ দিক আছে। তবে ব্যবহার যিনি করছেন, তিনি যদি সচেতন হন তাহলে তেমন কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয়।

শর্বরী জোয়ারদার (ছাত্রী): এর ভালো-খারাপ দুটো দিকই আছে। তবে আমাদের ভালোটাই নিতে হবে সবসময়। যদি পার্সোনালি আমার কথাই বলি, আমার দিন শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে। শুধু তাই নয় ঘুমোতে যাবার আগে অবধি আমি সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকি। যখনই বিভিন্ন সময়ে বোর ফিল করি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই। সবাই যে আমার খুব পরিচিত তাও নয়। তবে কথা বাড়তে বাড়তেই তো সম্পর্কে তৈরি হয়। আর একটা কথা হল সবসময় সব বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয় না, তাদের রেগুলার আপডেটস পাই ফেসবুকে। এটা তো মানতেই হবে ফেসবুক না থাকলে স্কুল, কলেজের বা ছোটবেলার বন্ধুরা কেউই এত ভালোভাবে কানেক্টেড থাকতে পারতাম না।

স্বপ্নময় গায়েন (ছাত্র): সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো দিক তো আছে তবে খারাপ দিক প্রচুর। প্রচুর ভেকধারী লোক আর অজস্র ফেক অ্যাকাউন্টের মালিক উপস্থিত আছেন ফেসবুকে। অনেক সময়ই তাদের চিনতে অসুবিধা হয়। আমার পাশের বাড়ির এক দাদাকেই চিনি যে কখনও পাশের বাড়ির লোকটা চূড়ান্ত অসুস্থ থাকলেও খবর নেয় না। অথচ ফেসবুকে লোকের কিছু হতে না হতেই এত সিমপ্যাথি দেখায় বলার মতো না। এটা মানতেই হবে ভার্চুয়াল জগতে মানুষ অনেকটাই যান্ত্রিক। প্রচুর ভালো মানুষ, ভালো বন্ধু যে ফেসবুকের দৌলতে পেয়েছি তা অস্বীকার করা যায় না। তবে মুখোশধারী, চরিত্রহীন বদ-বুদ্ধিসম্পন্ন কম লোকের সাক্ষাৎও পাইনি! আমার অনেক চেনা লোকই এই বিকারগ্রস্ত লোকেদের শিকার হয়েছে।

অতনু রায় (ছাত্র): বহুদিন যোগাযোগ নেই এমন অনেক বন্ধুকেই খুঁজে পেয়েছি ফেসবুকের দৌলতে। অনেক বন্ধুদের বন্ধুরাও আমার বন্ধু হয়েছে। আমরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন উদ্যোগ নিই, সেক্ষেত্রে সবাইকে এক ছাতার নীচে আনতে সোশ্যাল মিডিয়ার অবদান অনেক। অনেক সেম মেন্টালিটির মানুষকে একসঙ্গে পাওয়ায় বিভিন্ন রকম কাজ করতেও সুবিধা হয়। এতে অনেক ভালোলাগা যেমন আছে, তেমন খারাপ লাগাও আছে। আমার খুব প্রিয় এক বন্ধু অন্যরকম সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে সুইসাইডও করেছে এই ফেসবুকের কারণে। ডিপ্রেসড লোকদের ফেসবুক মেন্টালি কতটা পেশেন্স দেয় জানি না। তবে আমি কপাল করে প্রচুর ভালো দিদি, দাদা, আরও অনেক ভালো ভালো বন্ধু পেয়েছি।

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

নীতিন বসু

শৈবাল পত্রনবীশ

পর্ব: নয়

আগের সংখ্যায় আলোচনা করেছিলাম মণিমুক্তখচিত নিউ থিয়েটার্সের কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে। শিল্পী বলুন, চলচ্চিত্র পরিচালক বলুন বা কলাকুশলীসমৃদ্ধ নিউ থিয়েটার্স যেন একটি প্রতিষ্ঠান, যাঁরা এই স্টুডিওর সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাই পরবর্তীকালে ভারত বিখ্যাত হয়েছেন। আমরা এখন চিত্রপরিচালকদের সম্বন্ধে আলোচনা করছি। প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, বিমল রায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এঁদের সম্পর্কে আগেই জানিয়েছি। এবার চলে আসি, নিউ থিয়েটার্সের আরেক চিত্র পরিচালক নীতিন বসুর প্রসঙ্গে। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বিখ্যাত এইচ বোস পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বোন মৃণালিনী দেবীর সন্তান নীতিন বসু ছোটবেলা থেকেই চিত্রগ্রহণে পারদর্শী ছিলেন।

চিত্রগ্রহণের সূত্র ধরেই তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেন। সরকার সাহেব ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব খুশি হন। ধীরে ধীরে নীতিনবাবু বীরেন্দ্রনাথের খুব কাছের মানুষ হয়ে যান। শুধু ক্যামেরা নয়, কলাকুশলী নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় নীতিনবাবুকে। নীতিনবাবুর বিচারের ওপর সরকার সাহেবের ছিল অগাধ আস্থা। নিউ থিয়েটার্স থেকে ক্যামেরাম্যান হিসাবে নীতিন বসুর খ্যাতি দেশজোড়া ছড়িয়ে পড়ল। নিউ থিয়েটার্সে সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর প্রথম ছবি 'দেবদাস'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নটীর পুজা'-র তিনিই ক্যামেরাম্যান ছিলেন। এখানে কাজ করার সময় তিনি চিত্র পরিচালক হিসাবে পেয়েছিলেন দেবকী বসুকে। ওঁরা একসঙ্গে অনেকগুলো ছবিতে কাজ করেছেন। সরকার সাহেব লক্ষ করতেন যে নীতিনবাবুর মধ্যে অনেক ধরনের গুণ আছে। একদিন সরকার সাহেব তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি

এবার চিত্র পরিচালনার কাজ করতে পারো।' নীতিন বসু এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হলেন।

মি. সরকারের ইচ্ছানুযায়ী দেবকীবাবুর বাংলা 'চণ্ডীদাস'-এর হিন্দি ভার্সান পরিচালনা করলেন নীতিন বসু। ১৯৩৮ সালে তাঁর 'দেশের মাটি' মুক্তি পেয়েছিল। এই ছায়াছবিটিকে একটা মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। এরপর এনটি-র ব্যানারে অনেকগুলি ছবি তিনি পরিচালনা করলেন। নীতিন বসুর আমলেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম প্লে-ব্যাক সংগীতের ব্যবহার শুরু হয়। ছবির নাম 'ভাগ্যচক্র'। গান গেয়েছিলেন কে সি দে, পারুল ঘোষ এবং সুপ্রভা সরকার।

এর কিছুদিন পরে নীতিনবাবু বোম্বে চলে গেলেন। বোম্বে টকিজের ব্যানারে নির্মাণ করলেন 'নৌকাডুবি', যার হিন্দি ভার্সান 'মিলন'। এই 'মিলন' ছবিতে দিলীপ কুমার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে ফিল্মিস্তানের ব্যানারে তৈরি হয় তাঁর কালজয়ী ছবি 'গঙ্গা যমুনা'। ১৯৭৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে সম্মানিত করে। নীতিনবাবু ছিলেন একাধারে ক্যামেরাম্যান, চিত্রপরিচালক, গল্পলেখক এবং চিত্রনাট্যকার। এইজন্যই তাঁকে বলা হয় 'বিরল প্রতিভা'।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

শহরের দেওয়ালগুলোতে লেগে আছে শৈশবের স্মৃতি

সাদিয়া আফরিন (সংগীতশিল্পী)

কলকাতা আমার কাছে সংগীতনগরী। সেই সঙ্গে আমার প্রথম জীবনের আশ্রয়দাতা।আমার জন্মদাতা আব্বা-আম্মির মতোই আমার অন্য এক সত্তার জননী। কারণ আমার জীবনের এত গান, এত সুর, এত ছন্দ—এসব দিয়ে আমাকে ভরিয়ে তুলেছিল কলকাতা। আমি যখন প্রথম কলকাতায় এলাম তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। ঠিকমতো কথা বলা শিখেছি বলেও মনে পড়ে না। অথচ আমার জানের জান কলকাতা তার মাটি, জল, বাতাস দিয়ে আমাকে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে ধরে। তারপর একটু বড় হতে গানের সুর-লয় আমাকে পাগল করে তোলে।

আমার কাছে মায়া সেন-শান্তিকেতন-কলকাতা সে এক মোহময় অদ্ভুত সময়। প্রথম জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি নানার রয়েড স্ট্রিটের বাসায়। আব্বা অনেক ছোটবেলায় অনন্তলোকের যাত্রী হয়ে যান। তাই আম্মি আর আমার সংগ্রামের জীবনে আম্মি বাংলাদেশে থাকলেও আমার ঠাঁই হয় কলকাতায়। আমার প্রথমজীবন কাটে কলকাতায় তাই এই শহর আমার অনেক ভালোবাসার শহর। গানের প্রতি আমার টান ছোটবেলা থেকেই, তাই নানার উৎসাহে অনেক গুরুর কাছে শিখতে শিখতে শেষমেশ যাঁর কাছে গান শেখবার সুযোগ হল আমার, তাঁকে আমি ঈশ্বর মানি আজও। তিনি মায়া সেন।

ধর্মতলা চত্বর আমাদের ছোটবেলার অনেক স্মৃতি বহন করে আজও। বদলে গেছে সেইসব রাস্তাঘাট। বলতে গেলে এখনও যখন সেই ফুটপাথ ধরে হাঁটি, মনে হয় শহরের দেয়ালগুলোতে লেগে আছে আমাদের শৈশবের স্মৃতি। আমার তখন ১৩ বছর বয়স গান শিখছি দিদিভাই(মায়া সেন)-এর কাছে, মনের ভেতর সে এক অদ্ভুত প্রফুল্লতা। আম্মিকে ছেড়ে এত দূরে থাকার কষ্ট লাঘব করার একটাই উপায় তার কাছ থেকে

শিখেছিলাম গান আর গান। মন ও মননের সমস্ত কষ্ট লাঘব করতে পারে একমাত্র এই সংগীত।

এরপর আম্মি আমাকে নিয়ে চলে এল এদেশে। সংগীত তখনও আমার মননে-চিন্তনে দিনজাগরণের সঙ্গী। এদেশে এসে আবার নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিলাম ফের শুরু হল রেওয়াজ। ধীরে ধীরে গান কে ভালোবাসলাম, গান আমাকে। গানের জগৎ ততদিনে অনেকটাই আপন করে নিয়েছে আমাকে। তারপর এই গানের টানেই রুনা (রুনা লায়লা) আপার সাথে চলে গেলাম আবার ওপার বাংলায়, রবীন্দ্রসদনে। সালটা ২০১৪। আমাদের পরিবেশনা সকলেরই খুব পছন্দ হল। আমরাও খুব খুশি। তবে কোথাও যেন একটা শূন্যতা গ্রাস করছিল আমাকে। শহরটা আছে তবু জল-হাওয়ায় কী যেন একটা নেই। দিদিভাই নেই। বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পর কথা হয়েছে ফোনে, তবে দেখা আর হয়নি।

এই প্রথম নিজের শৈশবের শহরকে এক ভিনদেশির চোখ দিয়ে দেখছিলাম। সেই রাস্তা-ঘাট, শ্যামবাজার-বিডন স্ট্রিট, রাসমনি রোড সব বহু চেনা জায়গাগুলো বড় অদ্ভুতভাবে চেয়েছিল আমার দিকে। নানার বাড়ির সামনের রাস্তাটা, পার্ক স্ট্রিট থেকে হেঁটে কয়েক মিনিটের পথ। সেই অনেক চেনা রাস্তাটাও বড় অদ্ভুতরকম বদলে গেছে। তবু আমি যেন তাতেও দেখতে পাচ্ছিলাম আমার শৈশবের দিনগুলোর লুকোচুরি খেলা।

কলকাতায় এসে অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডাও দিলাম। তবে এই আড্ডা দিতে কফি হাউস যাওয়া এই প্রথমবার। বইপাড়ায় অবশ্য ছোটবেলায় দু-একবার গেছি তবে তখন অনেক ছোট, তাই ফিকে হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো বারবার নাড়া দিচ্ছিল। সেবার চারদিন ছিলাম কলকাতায়। আকাশবাণীর অনুষ্ঠান তারপর কসবাতে একটা অনুষ্ঠান করে যখন দেশে ফিরব তখন বারবার মনে হচ্ছিল সময়টা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল।

সবশেষে একটা কথাই খুব লিখতে ইচ্ছে করে তা হল এই ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে ফারাক কিছু আমার নজরে আসে না। যা আসে তা হল শক্ত মোটা কাঁটাতারের বেড়া। ভালোবাসার টানে কলকাতায় আমি বারবার যাব। কলকাতা আমার শৈশবের শহর। কলকাতা আমার প্রাণের শহর।

চিরসবুজ প্রেয়সী

অসীম সরকার

দর্শকরা তাঁর সাথে খোলি হাওয়ামে ভোলে, আজ মেরা মন বোলে, দিলকি বাহার লেকে আয়েগা সাওয়ারিয়া গানের সুরে মেতেছেন। এমনকী তার চলন-বলনের নিজস্ব স্টাইল যুবতীদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। তার শাড়ি পরা বা চুল বাঁধার কেতা ছিল পঞ্চাশ-ষাটের দশকে কলকাতা, ঢাকার বাঙালি সমাজে আভিজাত্য ও ফ্যাশন সচেতনতার প্রতীক। সেই সঙ্গে বাঁকা ঠোঁটের হাসিতে বহু তরুণের হৃদস্পন্দনও বাড়িয়েছেন যিনি, তিনি সুচিত্রা সেন।

করুণাময় আর ইন্দিরা দাশগুপ্তের জমজমাট সংসারে ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল যোগ হল একটি ছোট্ট সদস্য, তাঁদের মেজো মেয়ে কৃষ্ণা। গায়ের রং চাপা বলে প্রথমে তার নাম রাখা হল কৃষ্ণা। নামটি দিয়েছিলেন কৃষ্ণার পিতামহ জগবন্ধু দাশগুপ্ত, যাঁকে নাম রাখার ক্ষেত্রে মানা হত পরিবারের হেডঅফিস! কিন্তু করুণাময়ও (কৃষ্ণার বাবা) পিছিয়ে নন, সাধ করে মেয়ের আরেকটি নাম রাখলেন, 'রমা'। 'কৃষ্ণা' নামের অবয়ব সরিয়ে 'রমা' নামেই ক্রমশ বড় হতে থাকে মেয়েটি। এরই মধ্যে পাটনা থেকে বদলি হয়ে বাংলাদেশের পাবনায় চলে এসেছেন করুণাময় দাশগুপ্ত। ফলে পাবনাতেই কাটে সুচিত্রার শৈশব-কৈশোর।

১৯৪৭ সাল। সতেরো বছর বয়সে ফ্রক ছাড়তে না ছাড়তেই বিয়ের বাদ্যি বাজল রমার। পুরীতে বাবা-মায়ের সাথে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই দিবানাথ সেনের

ঠাকুমার চোখে ধরা পড়লেন রমা। এরপর দিবানাথের পিতা ব্যারিস্টার আদিনাথ সেন যখন প্রথম দেখলেন তাকে, তখনই ছেলের বউ করে নিতে চাইলেন। এতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনওটাই দেখাননি বিয়ের ব্যাপারে-এ যেন এমন একটা কাজ যেটা তাকে করতেই হতো, তাই করলেন।

বিয়ের পর নতুন পরিবেশে একা রমা আরও বেশি একা হতে থাকেন। আর এই একাকীত্বই একসময় তাঁর অভিনয় জগতে প্রবেশের ইন্ধন হিসাবে কাজ করে। পাড়ার ক্লাবের কিছু ছেলেরা সুচিত্রাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিতে চায় তাদের নাটকে। 'নটীর পূজা' নাটকে প্রথম অভিনয় করলেন এবং সেই নাটকে তার অভিনয়ের খ্যাতি পৌঁছলো টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায়। এমত অবস্থায় স্বামী ও শ্বশুরের উৎসাহেই সিনেমায় নামলেন রমা সেন।

১৯৫২ সালে রমা সেনের প্রথম ছবি 'শেষ কোথায়'। এরপর সুকুমার দাশগুপ্তর 'সাত নম্বর কয়েদী'। এছবিতে তিনি আর রমা সেন নন। সুকুমার দাশগুপ্তর সহকারী নীতীশ রায় তার নতুন নাম দিলেন 'সুচিত্রা'। যে নামের মধ্য দিয়ে নবজন্ম ঘটল তাঁর এবং নবজন্ম হল রুপোলি পর্দার।

চরিত্রের সীমাবদ্ধতায় কখনওই আটকে থাকেননি তিনি আর আটকে থাকতে পারেনি তার গ্ল্যামারও! যখনই যে চরিত্রে পর্দায় আসুন না কেন তিনি, চোখ আটকে যাবার মতন কিছু একটা সবসময়ই থেকে যেত তার মধ্যে। সেটা ভক্তিরসে টইটুম্বুর 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'তে বিষ্ণুপ্রিয়া কিংবা 'সপ্তপদী'তে আধুনিকা রিনা ব্রাউনই হোন—সুচিত্রার জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি বা তাঁর গ্ল্যামার কিছুতেই লুকিয়ে থাকেনি।

সুচিত্রা সেনের নাম শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নাম স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে। তিনি সকলের প্রিয় উত্তমকুমার। উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেনের পর্দার রসায়ন কার না মন কেড়েছে! ১৯৫৪ সালের ২৬ জুন থেকে শুরু করে বহু সিনেমায় একসাথে আবির্ভূত হলেও, ১৯৫৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পরিচালক অগ্রদূতের 'অগ্নিপরীক্ষা' সিনেমাটিতেই তাঁদের জুটি প্রথম সাফল্য পায়। টানা ১৫ সপ্তাহ হলে চলেছিল এই সিনেমা। ইতিহাস সৃষ্টি করা এই সিনেমা উত্তম-সুচিত্রা জুটিতে সিনেমা জগতে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পেছনে এই ছবিটিই প্রথম মাইলফলক স্থাপন করেছে। সুচিত্রার অভিনীত বাংলা সিনেমার সংখ্যা ৫২টি আর হিন্দি ৭টি। বাংলা চরিত্রের পাশাপাশি হিন্দি চলচ্চিত্রেও সমান স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি কোথায় অভিনয় করবেন, কোন ব্যানারে তাঁর নাম আসবে, তা শুধু তিনিই নির্ধারণ করতেন। তাঁর সময়ের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিতেন তিনি। 'সপ্তপদী' সিনেমাটির কথাই ধরা যাক, তাতে সুচিত্রা সেনের পারিশ্রমিক ছিল দু'লক্ষ টাকা, যা সে-সময়ের যে কোনও অভিনেতার চাইতে বেশি।

সুচিত্রা ঘাড় ঘুরে তাকালে সময় আজও একটু থমকে যায় নাকি? যায়। পর্দায় সুচিত্রার চোখ টলমল করে উঠলে আজও জল গড়ায় পর্দার এপারে। তাঁর মুগ্ধতাকে আকণ্ঠ গ্রহণ করেছে যে অগণিত দর্শকসমাজ। আসলে সুচিত্রা সেন এক চিরসবুজ প্রেয়সী, যাঁর বয়স ওই পর্দার ছবিতেই আজও স্থির হয়ে আছে।